International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-V, September 2021, Page No. 49-63
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i5.2021.49-63

বৈবাহিক রাজনীতি ও লৈঙ্গিক প্রতিরোধ: মহাকাব্যিক মাদ্রীর পুনর্নির্মাণ

অংকিতা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Abstract:

Ancient epics have always carried the pattern of a nation's overall heritage. They are analyzed in various arguments for the needs of the era. The Indian epic Mahabharata has been discussed by writers, scholars or researchers from different perspectives in different branches of literature, as well as using various arguments and thoughts on those anecdotes or characters of the Mahabharata. From Bankimchandra, Michael Madhusudan, Rabindranath Tagore to Buddhadev Bose, Manaj Mitra, Nrisingha Prasad Bhaduri, Bani Basu and many others, has sometimes rationalized the Mahabharata in different genres of literature, sometimes reinterpreted the Puranas. Deepak Chandra is the most unique author here. He is credited with writing the mythological fictional literature in Bengali language. Mahabharata's charecter 'Madree' is being re-created in one of his novel, named 'Madreer Kanthaswar'. Without Madree, the story of Mahabharata would have been different. But Byasadeva's apathy to that character seemed to be a conspiracy to the writer. Deepak Chandra thinks that there was an apparent conflict between Bhishma and Byasadeva. But why? There are also some more questions, for example, what is Kuntee's emphasis on Pandu even in the presence of Madree? What was the illicit relationship between Kuntee and Bidur? Were Kuntee and Madree at all like sister according to Byasadeva? Did Pandu and Madree take their death bow on purpose after being aroused? How could Pandu, who had not had intercourse with his wives for so long for fear of a curse, suddenly forget everything in an instant? What was the urge to coexist in Madree where other widows were present in the family? Above all, whose children were the Pandavas? The novel tries to find a solution to all these questions. The author has tried to fill the gap between the two lines in the Mahabharata. All his novels are myth-based and brain-stimulating. We are here to review the author's artistry in this discussion, as well as to judge his newly constructed 'Lady Madree' in terms of logic.

Keywords: Mahabharata, Modern constructions, Broke old Judgement, Family Politics, Madree's Sacrifice, Refelects Today's era, Woman perspective.

একটি জাতির ইতিবৃত্তকথা কাহিনির আকারে ধারণ করে থাকে মহাকাব্য। সে অর্থে *রামায়ণ* ও *মহাভারত* কেবল ভারতীয় সভ্যতা এবং ইতিহাসের জন্যে ঘটনাবহুল নয়, আসলে তা সমগ্র ভারতীয় সভ্যতার মূল

আধার। এই দুই মহাকাব্যের প্রভাব সাহিত্য, ধর্ম কিংবা সংস্কৃতির ওপরেই শুধু পড়ে নি, তা একই সাথে ছিল রাজনীতিকও। বাস্তবিকই, কাব্যের আকারে লেখা রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির এক অনবদ্য ঐতিহাসিক দস্তাবেজ হল সেই দেশের মহাকাব্য। হোমারের লেখা *ইলিয়াড-ওডিসি* যেমন গ্রীক দেশের জনকথার ধারক ও বাহক, তেমনই ভারতবর্ষ *রামায়ণ-মহাভারতের* স্ব-ভূমি হিসেবেই পরিচিত; মহাকাব্যদ্বয় ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। এখানে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, ভারত এবং ভারতীয়দের মন মানসিকতা এ দুটি মহাকাব্য ছাড়া উপলব্ধি করা অসম্ভব। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদুটিতে বর্ণিত কাহিনীগুলি প্রায় ১০০০ থেকে ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের। এই মহান কাব্যগুলির উৎস ছড়িয়ে রয়েছে গাথা, লোকগাথা, গীতগান কিংবা নায়ক ও তাঁর বীরত্বপূর্ণ কোনও ঘটনার মধ্যে।[১] সেদিক দিয়ে দেখলে উভয়েই ভারতবর্ষের *ইতিহাস* বা ইতিহাসের অংশ। সাধারণভাবে সকলেরই জানা, ভারতবর্ষে চারটি *বেদ* রয়েছে – *ঋক, সাম, যজু* এবং *অথর্ব বেদ*। পরবর্তীকালে সমালোচকেরা আরও এক ধরণের বেদের কথা বলেছেন। দার্শনিক দিক থেকে, ধার্মিক দিক থেকে কিংবা ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যাক না কেন, এই চার বেদ অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না সেই পঞ্চম বেদের কথা উল্লেখ করা হয় – *ইতিহাস বেদ।* ইতিহাস যেহেতু পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র হিসেবেও সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে,[২] তাই মহাভারত এবং রামায়ণকে পঞ্চম বেদ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এখানে কাহিনী এবং চরিত্র বা ঘটনা কাল্পনিক হলেও যে প্লটের উপর নির্ভর করে এই কাব্যকাহিনী রচনা করা হয়েছে, তা মূলত ঐতিহাসিকভাবে সত্যতা বজায় রাখে। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন ভারতবর্ষের একটা চালচিত্র বা প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে; অনুধাবন করা যায় সেসময়ের ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি এবং দর্শন।

এই মহাকাব্য কাল্পনিক কাহিনি এবং চরিত্রের প্রাচুর্য ও বিচিত্রতায় যেমন পরিপূর্ণ, তেমনি চেতনা ও গভীর মনস্তাত্ত্বিকতার আবহে শতাব্দী প্রাচীন হওয়া স্বত্বেও আজও সমপরিমাণ আগ্রহের দাবিদার। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে একটি হল ভারতীয় সভ্যতা; যার সাংস্কৃতিক ইতিহাস ধরা আছে ভারতীয় মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন ভাষায় মহাকাব্যগুলির চর্চা হয়ে এসেছে যুগে যুগে, কালে কালে। সময়ের প্রেক্ষিতে সেই প্রাচীন মহাকাব্যগুলি বারবার বিশ্লেষিত হয়েছে নবনির্মাণে - কখনও অর্থনৈতিক, কখনও সমাজতাত্ত্বিক, কখনও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তবে একথা সত্য যে, মহাকাব্যগুলির প্রাথমিক পরিচয় সাহিত্য হিসেবে, যে সাহিত্য ধারণ করে রেখেছে ভারতীয় সভ্যতার শিকড়কে; যার দর্পণে শুধু সেকাল নয়, একালও ধরা পড়ে। একইসাথে তা হয়ে উঠেছে পুরাকালীন ও সমকালীন। আর সেজন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, জাতির সামগ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে মহাকাব্য।

দীপক চন্দ্র[৩] একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। পুরাণকে নিয়ে একাধিক রচনার জন্যে বাংলা সাহিত্যে তিনি *মাইথোনভেলিস্ট* নামে প্রখ্যাত। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে পুরাণকে নিজের জায়গায় রেখে বিশ শতকীয় মানসিকতায় প্রাধান্য দিয়ে কাহিনীর নববর্ণন করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে ভারতীয় মহাকাব্য এবং পুরাণকে অবলম্বন করে লেখা তাঁর রচনাগুলি, যেগুলি একেবারে ভিন্নধর্মী চিন্তাচেতনার স্তর থেকে উত্থিত। প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্যের নবনির্মাণের আলোচনা প্রসঙ্গে দীপক

চন্দ্রের নাম অনস্বীকার্য। প্রাচীন পুরাণের যুগ থেকে তিনি তুলে এনেছেন এক একটি চরিত্রকে – ঘটনাকে; যুক্তিপূর্ণ আধুনিক ব্যাখ্যায় তাদের বিশ্লেষণ করেছেন। ফ্ল্যাশব্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন সেই পৌরাণিক সমাজ, ঐতিহাসিক সেই মানবধর্মকে। একটি সাধারণ ঘটনা ও চরিত্রও যে কতটা বৈচিত্র্যময় মনোভাব প্রকাশের অবকাশ রাখে, তাদের ধরে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক। ফলে ভিন্নচোখে দেখা সেই সাহিত্যকে আজকের মানসিকতায় রেখে তাঁর স্বাদ চেখে দেখবার তাগিদ তৈরী হয়।[৪] কথাসাহিত্যিক দীপক চন্দ্রের সেরূপ একটি বিখ্যাত উপন্যাস **'মাদ্রীর কণ্ঠস্বর'** নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। আলোচ্য প্রবন্ধের কেন্দ্রে রয়েছে রাজা পাণ্ডুর দ্বিতীয়া স্ত্রী *মাদ্রী*। কাহিনীর সাথে সমভাব মিলিয়ে রেখে চরিত্রটির মানসিকতা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে কীভাবে *মহাভারতের মাদ্রী* বিশশতকের মাদ্রী হয়ে উঠেছে। বস্তুত, এখানে পুরো ঘটনাই ভিন্ন দৃষ্টিকোণে উপস্থিত করেছেন দীপক চন্দ্র। মাদ্রীকে দিয়েছেন নব যুগমানসিকতা, তাকে মুক্তি দিয়েছেন আধুনিক পাঠকের হাতে। তবে সেই চরিত্রটি নিয়ে আলোচনায় অগ্রবর্তী হবার আগে মহাভারতের সাথে উপন্যাসের যোগাযোগ এবং মহাভারত নিয়ে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা প্রসঙ্গে কিছুটা অবহিত হয়ে মূল অংশে প্রবেশ করলে আলোচনাটি স্বচ্ছ হবে।

দীপক চন্দ্র, প্রাচীন ভারতীয় মিথলোজি, বিশেষ করে পুরাণ, মহাকাব্য নিয়ে সাহিত্যচর্চা করে এক নতুন ঘরানার উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। এর আগেও পুরাণ-মহাকাব্য নিয়ে যে সাহিত্য চর্চা হয়নি, তা নয়; কিন্তু উপন্যাসের অবয়বে যে এভাবেও ভাবা যেতে পারে, দীপক চন্দ্র তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সমরেশ বসুর 'শাম্ব', 'পৃথা', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'পাঞ্চজন্য', বিমল করের 'যদুবংশ', সুনীল গাঙ্গুলীর 'রাধাকৃষ্ণ', সাম্প্রতিক কালে লেখা হর্ষ দত্তের 'বিকর্ণ', তিলোত্তমা মজুমদারের 'অর্জুন ও চারকন্যা' ইত্যাদি কিছু উপন্যাস বিক্ষিপ্ত ভাবে সাহিত্যিকেরা লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'পৌরাণিক উপন্যাস'[৫] নামে পৃথক কোন সাহিত্যধারা পূর্বে ছিল না, যেমন ছিল 'পৌরাণিক নাটক'। অন্য লেখকদের নাম উচ্চারণ করলেও একটি ধারা নির্মাণে যে পরিমাণ আবেগ দরকার হয়, সেটা দীপক চন্দ্রের মধ্যেই বর্তমান ছিল। বর্তমানে বাংলার বাইরে পুরাণকে নিয়ে ব্যাপক পরিমাণে কাজ করে চলেছেন এই প্রজন্মের লোকেরা, যেমন, দেবদূত পট্টনায়কের নাম অনেকেরই জানা। এতো গেল ভারতবর্ষের কথা, ইউরোপের মতো মহাদেশে এই দুই ভারতীয় মহাকাব্যকে নিয়ে যে উন্মাদনা দেখা যায়, তা বাংলায় একপ্রকার নেই বললেই চলে। আর এখানেই দীপক চন্দ্রের অবদান বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। তাঁর নিরলস অধ্যয়ন ও গবেষণায় একের পর এক যুগান্তকারী লেখার জন্ম হয়েছে, এবং বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক উপন্যাসের ধারাটিকে বলবৎ করেছে। উপন্যাসও যে পুরাণকে আলেখ্য করে আধুনিক রূপ নিতে পারে এবং দীর্ঘদিনের পরিচিত কাহিনীতেও যে নতুনের চমক আনতে পারে, এর জলজ্যান্ত নিদর্শন দীপক চন্দ্রের অনবদ্য লেখাগুলো।[৬]

প্রকৃতপক্ষে, মহাকাব্যের চিরাচরিত ধ্যানধারণাগুলোকে বদলে ফেলে এর ভেতরের ভিতটাকে নাড়িয়ে দিয়েছেন দীপক চন্দ্র। পৌরাণিক চরিত্রেরা তাদের আজন্ম লালিত এপিক গাম্ভীর্যকে ঝেড়ে ফেলে নিজেদের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলোকে প্রকাশ করেছে। দীপক চন্দ্র পরমযত্নে তাদেরকে সাহিত্যে রূপ দিয়ে প্রাচীন ও নবীনকে মিলিয়েছেন। ধর্মের চশমা খুলে রেখে যুক্তির আলোয় সেই রহস্য ভেদ করে তাদের মুক্ত করেছেন। জাতি, বর্ণ, বৈধ-অবৈধ, অলৌকিকতার মায়াজাল ছিন্ন করে সম্ভাব্য যুক্তি-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাতে করেই তাঁর রচনায় মহাকাব্যীয় চরিত্রেরা কখনও আত্মমর্যাদায় প্রতিবাদ করে উঠেছে,

আবার আজন্ম প্রতিপালিত নেগেটিভ চরিত্ররাও নিজের কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে। জারজ সন্তান হবার অপমান-গ্লানিকে সাধারণ পাঠকের সাথের ভাগ করে নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমনকি তথাকথিত সৎ চরিত্রদের গা থেকেও খসে খসে পড়েছে তাদের অতি যত্নে, সংগোপনে রাখা লালসার অদম্য আদিম বন্য রূপ। পুরাণের মনোধর্মের সাথে সংঘাতের ফলেই দীপক চন্দ্রের রচনায় গড়ে উঠেছে নব-পুরাণ। স্বনামধন্য ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় মন্তব্য করেছেন –

> দীপক চন্দ্র কিন্তু একালের ভাষায়, স্বাভাবিক জীবনের ছবি করেই সব কিছু এঁকেছেন। পৌরাণিক বলে প্রাচীনতার যতটা ছাপ থাকা দরকার তা আছে, কিন্তু পুরাণ-বিলাসিতা নেই।[৭]

'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক নিজের চিন্তাধারার ওপর থেকে নিজেই পর্দা সরিয়ে আলোকপাত করেছেন,

> অলৌকিক কাহিনী হয় বর্জিত হয়েছে, না হলে তার বাস্তব ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, পৌরাণিক ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য আধুনিক মানুষের চিন্তা, রুচি ও মেজাজের ওপর গুরুত্ব অর্পণ করেছি। পুরাণের পৌরাণিকতাটুকু রেখে আজগুবি অসম্ভব ঘটনার ভার হালকা করেছি।[৮]

প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ অতিক্রম করে আজকের যুগে এসে যখন সকলে দাঁড়িয়েছি, সেখানে যুক্তি, চিন্তা, ধ্যান ধারণার মধ্যে একটা বিস্তর ফারাক ঘটে গেছে। বদলে গেছে ধর্মীয় চেতনা-ভাবনা। কিন্তু প্রাচীনকে বাদ দেওয়া যায় না। প্রাচীনের মধ্যে যে মানবিক বোধের উৎসার পরিলক্ষিত হয়, আধুনিকমন তা নিয়েই নতুন ভাবনায় তারই একটা নবরূপ আবিষ্কার করে। এলিয়েট যেমন বলেছিলেন, Literature is a continuous process. মহাভারতকার ব্যাসদেব নিজেই মহাভারতের আদিপর্বে শ্লোকের আদলে লিখেছিলেন, কিছু কবি এই ইতিহাস আগে বলে গেছেন, বর্তমানে কিছু কবিরা বলছেন, আবার আগামী ভবিষ্যতেও অন্য কবিরা বলবেন। সুতরাং মানুষের সুক্ষ্ম অনুভূতিগুলো বরাবরই সাহিত্যের বিষয় এবং চিরকালীন। সেই অনুভূতিই বিভিন্ন চেহারায় সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় পরিবেশিত হয়। রামায়ণ-মহাভারত সেভাবেই পরবর্তী সাহিত্যকে নানা উপাদান জুগিয়ে চলেছে। তাতেই বাঙালিয়ানা মিশিয়ে কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস অনুবাদ করেছেন বাঙালি মহাকাব্য। পরে তাতে বারে বারে নবচেতনার স্পর্শ লেগে তা নতুন অভিনবত্ব লাভ করেছে। মনে পড়ে যায় দত্তকবি মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'এর কথা, যেখানে রামায়ণের রামের নায়কত্ব খসে পড়েছে আর রাবণরাজ ও মেঘনাদ বীরত্বে দৃপ্ত। অন্যদিকে, প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে' কৌরববংশের গরিমা ও পাণ্ডবদের ছলনাই প্রকটিত। কৃষ্ণকে নিয়ে বঙ্কিমের প্রবন্ধগ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র' অনেক নতুন জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছিল সকলের সামনে। একই সাথে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন'র কথাও মনে আসে। অপরদিকে মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' হল প্রথম মৌলিক নাটক যার মূল উৎস সেই মহাভারত। এছাড়াও বুদ্ধদেব বসু, মনোজ মিত্র প্রমুখ আরও অনেকের নামই কথাপ্রসঙ্গে উঠে আসে, যারা মহাকাব্য নিয়ে নাটক-গল্প লিখেছেন। প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী সারা জীবন ধরে পুরাণ-মহাকাব্য চর্চা করে চলেছেন, তাঁর লেখা নতুন করে এই কাব্যদুটিকে নিয়ে ভাবায়। এভাবেই আধুনিক দৃষ্টির আলোয় মহাকাব্যগুলি নবনির্মিত হয়েছে এবং

হতেও থাকবে। প্রমথনাথ বিশী তাই যথার্থই বলেছিলেন, *যাবতীয় ক্লাসিক সাহিত্য আরব্য রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো আপন দেহ হইতে যুগে যুগে নবতর সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনকে তৃষ্ণার বারি যোগাইয়া আসিতেছে।*[৯]

মহাভারত একদিকে যেমন চরিত্রের এক বিরাট কর্মশালা, অন্যদিকে তেমনি এখানে রয়েছে দৈবিক বা আশ্চর্য, অকল্পনীয় সমস্ত ঘটনার অবতারণা। কিন্তু মহাভারতের বড় বড় চরিত্রের আড়ালে রয়েছে এমন কিছু কিছু চরিত্র, যাদের মহাভারতে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। ব্যাসদেবের সাপেক্ষে সম্ভবত চরিত্রগুলি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ সকল ক্ষেত্রে দীপক চন্দ্রের মতো ঔপন্যাসিক একদিকে যেমন মহাভারতের যাবতীয় অলৌকিক কিংবা দৈবিক শক্তিকে বর্জন করেছেন, তেমনি সেই চরিত্রগুলোকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাদেরকে রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের আকারে নির্মাণ করেছেন। তাদের কণ্ঠে এমন শব্দ বসিয়েছেন যা আগে কখনো শোনা যায়নি। খুব ছোট বা মার্জিনাল চরিত্র হলেও, শক্ত করে এদেরকে এমন ভাবে দাঁড় করিয়েছেন যে এরা মহাভারতে যতটা অবহেলিত, ততটাই সাহসী ও নির্ভীক চরিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে *মহাভারতের মাদ্রী* হল দীপক চন্দ্রের হাতে নবনির্মিত সেরকমই একখানি চরিত্র।

দীপক চন্দ্রের আলোচনা থেকে অনুভব করা যায় যে, মাদ্রীকে নিয়ে এরকম উপন্যাস রচনা করবার কারণ এটাই যে মহাভারতে মাদ্রীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। দীপক চন্দ্র ব্যাসদেবের কূটনৈতিক রাজনীতি তুলে ধরতে গিয়ে মাদ্রীকে যেভাবে নবনির্মাণ করলেন, তাতে এই চরিত্রটা পরিণত হয় আধুনিক নারীতে। লেখক দেখান, মাদ্রী মূলত ছিল মহাভারতের এক গোপন রাজনীতির শিকার, অথচ সেও কিন্তু ছিল রক্তমাংসের মানুষ। দীপক চন্দ্রের মাদ্রী নিজের অধিকার, নিজের ইচ্ছা বা চাহিদা উল্লেখ করতে জানে। শুধু তাই নয়, অন্যের রাজনীতির মোহরা বা গুটি হতে সে অস্বীকার করেছে। ব্যাসদেবের মহাভারতে যে ছিল শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র চরিত্র, বিরাট মহাভারতের শুধুমাত্র কয়েকটি পাতায় যার অস্তিত্ব, যার কোন নিজস্ব বক্তব্য ছিল না, যে সব সময়ই অন্যের রাজনীতির লক্ষ্যবস্তু ছিল, সেই মাদ্রী দীপক চন্দ্রের উপন্যাসে একজন স্বাধীন নারীচরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মাদ্রীর চরিত্রটি বইয়ের পাতা হিসেবে হয়তো বেশি নয়, কিন্তু সে এমন একটি চরিত্র হয়ে উঠছে যে প্রত্যাখ্যান করছে সুখের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা ছলনাকে, প্রতিরোধ করছে তার ওপর হওয়া অপমানের, অসম্মানের এবং চক্রান্তের। এই মাদ্রীর নিজের একটা ধারণা বা কণ্ঠস্বর আছে, একটা নিজস্ব মতামত আছে। সে নিজের শর্তে যেমন বেঁচেছে তেমনই নিজের শর্তে মৃত্যুবরণ করেছে। দীপক চন্দ্র যেভাবে মাদ্রী চরিত্রটিকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন, তা প্রকৃতই স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের দাবী রাখে। কেননা এই নবনির্মাণের ফলে মাদ্রী চরিত্রটি মহাকাব্যের উপেক্ষিত চরিত্রদের ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের নবনির্মিত চরিত্রগুলোর একজন হয়ে উঠেছে, যারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে রাজনীতির ঘুঁটি হতে প্রত্যখ্যান করে এবং সেই রাজনীতিকে প্রতিরোধ করে উদাহরণ স্থাপন করে। মাদ্রীও তাই মধুসূদনের নবনির্মিত বীরাঙ্গনাদের মতো, সমরেশ বসুর পৃথা কিংবা শাঁওলি মিত্রের নাথবতী চরিত্রের মতো তেজস্বীনি চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দৃষ্টিতেই মাদ্রী চরিত্রটিকে নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা।

মাদ্রীর কণ্ঠস্বর:

মহাকবির মাদ্রী – মহাভারতের স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এই চরিত্রটির নবনির্মাণ প্রসঙ্গে পাঠকের মনে কৌতূহল তৈরী হওয়া স্বাভাবিক। সকলেই চিরচেনা সেই মাদ্রীকে দেখে এসেছে যার নিজস্বতা নেই। মহাভারতের অগণিত বিখ্যাত, কুখ্যাত কিংবা অখ্যাত চরিত্রের আড়ালে থেকে গেছে মাদ্রী। এতবড় মহাকাব্যের প্রথম খণ্ডের মাত্র তেরোটি অধ্যায়ে তার উপস্থিতি এবং মৃত্যুর পর এক ঝটকায় তাকে মুছে ফেলা হয়েছে মহাকাব্যের পাতা থেকে। মহাভারতে মাদ্রীর কাহিনী যেরকম পাওয়া যায়, তা হল, বাহ্লিক বা মদ্রদেশের (বর্তমানে কাশ্মীর-পাঞ্জাব এলাকাবর্তী স্থান) রাজা অর্ত্যায়নের কন্যা ও যুবরাজ শল্যের ভগিনী ছিলেন রাজকন্যা মাদ্রী। দেশের নামেই তার নাম, আলাদা করে কোনও নামকরণ করেন নি মহাকবি। মহাভারতের অনেক নারীচরিত্রদের ক্ষেত্রেই এরকম করতে দেখা গেছে। দেশ অথবা পিতার নামে তাদের পরিচয়, যেমন গান্ধার থেকে গান্ধারী, কুন্তীভোজ থেকে এসেছে কুন্তী কিংবা দ্রুপদ থেকে দ্রৌপদী বা পাঞ্চাল থেকে পাঞ্চালী। মাদ্রীও ব্যতিক্রম কিছু নয়। মহাকাব্যে তার মুখ্য পরিচিতি হস্তিনাপুরের রাজা পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রীর ভূমিকায়। পিতামহ ভীষ্মের উদ্যোগে তাদের বিয়ে। পরবর্তীতে স্বামী পাণ্ডু ও সতীন কুন্তীর সাথে রাজভবন ত্যাগ করে বনে কৃচ্ছ্রসাধন এবং পাণ্ডুর নির্দেশে নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরে নকুল-সহদেবের মত পুত্রের জন্ম। এরপর একদিন দুর্বার কামনায় কিন্দম মুনির দেওয়া অভিশাপ 'সঙ্গমে মৃত্যু' ভুলে গিয়ে পাণ্ডু মাদ্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হলে পাণ্ডুর মৃত্যু ঘটে। মহাভারতের যুগে অহরহ ঘটতে থাকা অভিশাপের মতো এখানেও নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায় মাদ্রীর। কিন্তু মহাভারতকার দেখিয়েছেন, এতসবের পরেও মাদ্রী সন্তুষ্ট হয়নি। সম্ভোগে তৃপ্ত নয় বলে সহমৃতা হয়ে মাদ্রী স্বর্গে যেতে চেয়েছে স্বামী ও নিজের ইচ্ছাপূরণ করতে। যৌনক্ষুধার অদম্য আকর্ষণে আপন সন্তান দুটিকে কুন্তীর হাতে সঁপে দিয়ে মাদ্রী স্বামীর মৃত্যুর দায় গ্রহণ করে সহমরণে আত্মবিসর্জন দিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। এভাবেই এঁকেছেন ব্যাসদেব মহাভারতের মাদ্রীকে।

অথচ দীপক চন্দ্রের উপন্যাসে পুরো মহাভারতের ছক বদলে গিয়েছে। পাল্টে গিয়েছে চিন্তা-ভাবনার সমীকরণ। মাদ্রীর জায়গা থেকে ভাবলে একথাই মনে হয়, একটি চরিত্র এত বছর ধরে চোখের সামনে থেকেও কীভাবে উপেক্ষিতা রয়ে গেল! সহানুভূতির জায়গায় দেখা তো দূরস্থান, উপরন্তু সম্ভোগলিপ্সার আরোপে আরোপিত করে তার স্থান গৌণ করে দেওয়া হয়েছে মহাভারতে। নিজের পাপের ফল নিজেকেই ভোগ করতে হয় - এই নীতির ফাঁদে ফেলে মহাকবি ব্যাসদেব দিয়েছেন তাকে মেরে। আর এভাবেই মহাভারতের জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকাদের ভিড়ে মাদ্রী ঢাকা পড়ে গেল চিরকালের জন্য। যে পাণ্ডব পরিবারে কুন্তী-দ্রৌপদীর মতো জ্বলজ্বলে ব্যক্তিত্বময়ী নারীদের অবস্থান, সেখানে খুব জোরালো চরিত্র না হলে অস্তিত্ব সংকট হবার কথাই। আবার মহাভারতে নকুল-সহদেবকেও সেভাবে নিজের মায়ের জন্যে হাহাকার করতে দেখা যায় না। কুন্তীকে পেয়েই যেন তারা ধন্য। এভাবে কুন্তী সম্পূর্ণরূপে মাদ্রীর অস্তিত্বটুকুকে গ্রাস করে নিয়েছে কাব্যে। ফলতঃ মাদ্রী খালি পাণ্ডুর স্ত্রী এবং নকুল-সহদেবের জন্মদাত্রীর পরিচয়েই এযাবৎ একজন সাধারণ রমণী হিসাবেই বেঁচে থেকেছেন নিজস্বতা হারিয়ে।

প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বাস করে আসা এই সাজানো গল্পের মোড়ক খুলতেই দীপক চন্দ্রের মহাভারতচর্চায় বেরিয়ে এল সম্পূর্ণ অচেনা এক মাদ্রী, যার কণ্ঠস্বর আর অস্বীকার করা যায় না।

ঔপন্যাসিকের প্রতি সবিশেষ ধন্যবাদ যে এই বিস্মৃতপ্রায় নারীটিকে ঘুরে দেখবার আন্তরিক প্রয়াস তিনি অনুভব করেছেন। তাঁর লেখা *মাদ্রীর কণ্ঠস্বর* উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করবার আগে মাদ্রীকে নিয়ে তাঁর এরূপ ভাবনার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে লেখকের বলা কথাই উল্লেখ করতে হয় –

> আমার দীর্ঘ লেখক জীবনে মাদ্রীর মধ্যে লুকনো এই রহস্যের দিকে ফিরে তাকানো হয়নি। কিন্তু মনের মধ্যে তার নিরন্তর যাওয়া আসা ছিল। ... হঠাৎই একদিন মাদ্রী আত্মপ্রকাশের দাবি করল। ভাবনার আলোয় উদ্ভাসিত হল তার জীবনের কত দিক। কোথায় তার দুঃখ, কোথায় তার ব্যথা, জীবনে কি পেল আর পেল না, কিংবা পেয়েও হারাতে হল কেন? ... অথচ, মহাভারতের গোটা আখ্যানে তার শিকড় ছড়িয়ে আছে। যে মাটি থেকে রস শোষণ করে গাছ বেঁচে থাকে সে গাছও খোঁজ রাখে না মাটির নিচে শিকড়কে কীভাবে লড়তে হচ্ছে। ব্যাসদেবের ফ্রেমেই “মাদ্রীর কণ্ঠস্বর”কে শোনানোর জন্য এই উপন্যাসের পরিকল্পনা।[১০]

তাঁর পরিকল্পনা কতটা যথোচিত হয়েছে, সেটা নিয়ে বলবার পূর্বে লেখকের এই আত্মসমীক্ষা যেমন উপন্যাসের বিষয় সম্পর্কে আন্দাজ দেয়, তেমনি মাদ্রীকে গভীর থেকে জানতে আগ্রহ যোগায়। প্রখ্যাত পুরাণবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী *মাদ্রীর* পরিচয় বেদব্যাসের সংস্কৃত শ্লোকের হাত ধরেই দিয়েছেন। ব্যাসদেব যেভাবে মাদ্রীকে তুলে ধরেছিলেন, প্রাবন্ধিক তাঁর নিজস্ব প্রয়াসে মাদ্রীকে নিয়ে আলোচনা করলেন বটে, তবে নবমির্মাণে তিনি যাননি। অন্যদিকে, দীপক চন্দ্রের *মাদ্রীর কন্ঠস্বরে'র* প্লটে এক নতুন মাদ্রী আত্মপ্রকাশ করল। উপন্যাসের গল্পগাথাকে সাজাতে গেলে ফাঁক রাখলে চলে না। তাই মহাভারতের সেইসব শ্লোকের পেছনে সযত্নে আড়ালে থাকা কথাগুলোকে নিজের বিচার-বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লায় মেপে নিলেন লেখক। শুরু করলেন তাঁর নব পুরাণ।

মহাভারতে মদ্রদেশ বলতে যে আজকের পঞ্জাব-কাশ্মীরের কথা বোঝানো হচ্ছে, পূর্বে তা বলা হয়েছে। নামের মধ্যেই রয়েছে মাদ্রীর বংশের গৌরব মহিমা। দীপক চন্দ্র দেখিয়েছেন, একটা সময়ে মদ্রদেশের রাজনৈতিক অবস্থান অস্তাচলে গেলে রাজা অর্ত্যায়ন নিজ ক্ষমতাবলে তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেন নি। সবই ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু অর্ত্যায়নের হঠাৎ মৃত্যুর ফলে সেই রাজ্যভার এসে পড়ে যুবরাজ শল্যের ওপর। এই রকম একটি সময়ে হস্তিনাপুর নরেশের বিচিত্র প্রস্তাব নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন মহামতি ভীষ্ম। দীপক চন্দ্র ভীষ্মের এই মদ্রদেশ যাত্রার পেছনের কারণটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা অভিনব। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর মদ্রদেশ যাওয়ার পশ্চাতে ভীষ্মের যে কোনো পূর্বপরিকল্পনা থাকবে লেখকের কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছে। অথচ সেটা যতোটা না সাম্রাজ্যগত, ততোধিক ব্যক্তিগত। ভীষ্ম আগেই শুনেছিলেন মদ্র রাজকন্যা মাদ্রী রূপসৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। এদিককার মেয়েরা যে বরাবরই সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া দেখতে হয়, সেটা অনেকটাই সেখানকার ভৌগলিক বিন্যাসের কারণে। ভীষ্ম মদ্রদেশের বর্তমান রাজা শল্যের কাছে মাদ্রীর পাণিপ্রার্থী হলেন নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর জন্য। লেখক মহাভারতের রাজনীতির দ্বারা এতোটাই সম্পৃক্ত ছিলেন যে প্রতিটি ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক কার্যকারণ অনুসন্ধান করেছেন। চরিত্রদের তৈরীও করেছেন সেই ধারণা থেকেই। তাই লেখকের রচনায় অল্প অল্প করে সেসময়ের ভারতবর্ষের রাজ্যনীতিও পরিষ্কার হতে থাকে। উপন্যাস পড়ে বোঝা যায়,

কুন্তীর সাথে পাণ্ডুর বিয়েটা ভীষ্ম কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। ব্যাসদেবের বৈবাহিক কূটনীতিটিকে ধরে ফেলে ভীষ্ম এবার নিজের চাল চাললেন। কৌরববংশের রাজা তিনি নন, অথচ যাবতীয় সিদ্ধান্ত তিনিই নেন। সেই দর্পে আঘাত করাই ছিল বেদব্যাসের লক্ষ। তারই পাল্টা দান ভীষ্মের উদ্যোগে পাণ্ডুর এই দ্বিতীয় বিয়ে। মহাভারতের কাহিনীকে নতুন ভাবে দেখতে গিয়ে লেখক ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের মধ্যেকার সম্পর্কটিকে যে রাজনৈতিক ঢঙে পরিবেশন করলেন, সেখানেই পরিষ্কার হয়ে আসে লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ। দেখা যায়, মদ্রদেশের নিয়ম অনুযায়ী কন্যাপণ দিয়ে মাদ্রীকে একপ্রকার কিনেই নিলেন ভীষ্ম। শল্যের পক্ষেও এই প্রস্তাব অস্বীকার করবার সাহস ছিল না, প্রথমত পূর্বে ঘটা কাশীরাজের কন্যাদের বিবাহবিভ্রাট স্মরণ করে, দ্বিতীয়ত মদ্রদেশের তৎকালীন সামরিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার কথা মাথায় রেখে। বড় বড় রাজা-মহারাজাদের পরিবারে রাজকন্যাদের সাথে এটাই হয়ে থাকতো। গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর সাথে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিয়েটাও ঠিক এভাবেই কূটনৈতিক উপায়ে নিষ্পন্ন করেছিলেন ধুরন্ধর ভীষ্ম।

এত সবের মাঝেও উপন্যাসে শোনা যায় অষ্টাদশ বর্ষীয়া মাদ্রীর আত্মসম্মানের কথা। সে অনুভব করতে পেরেছিল এরকম দ্বিতীয় বিয়ে কিছুতেই সুখকর হতে পারেনা। সহজাত ভাবে কোন স্ত্রীই তার স্বামীর ওপর দ্বিতীয় কোনও নারীর কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারেনা। ফলে এরকম বিয়ে উদ্বেগজনক ছাড়া কিছুই নয়। তাই ভীষ্মকেই দায়ী মনে হল মাদ্রীর। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নারীর জীবন নিয়ে পাশা খেলতে পুরুষদের আগেও বাঁধে নি, এবারেও বাঁধল না। বিশেষ করে বংশের প্রথা মানতে গিয়ে অর্থের বিনিময়ে মাদ্রীর যেভাবে কেনাবেচা হল, কোন আত্মসচেতন নারীই তা মেনে নিতে পারে না। তাও তখন, যখন সে এই অন্তরালের পেছনের ফন্দিটা ধরে ফেলতে পারছে। এমনকি পাণ্ডুকে বহুসম্ভোগী পুরুষ ভাবতেও মাদ্রীর দ্বিধা হয়নি। দেশ ও পরিবারের জন্য নারীদের কত লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সেটা মাদ্রীর মধ্য দিয়ে লেখক পাঠকদের অনুভব করান। এখানেই কী মাদ্রীকে তার পৌরাণিক খোলস ছেড়ে জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে দেখিনা! বিশ শতকের মানসিকতা, যুক্তি-বুদ্ধি মাদ্রীকে আসল ছবি একমুহূর্তে দেখিয়ে দিল। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, বেদব্যাস যাকে মোহরা করে মহাভারত রচনা করলেন, সেই মাদ্রী নামক নারীটি যদি না থাকতো, তাহলে ব্যাসের সাথে ভীষ্মের লড়াইটা হতো না। পাণ্ডুর প্রবজ্যা নেবার দরকারও পড়ত না, এরকম করুণ অকাল মৃত্যুও হত না। সে সিংহাসনের দাবী ছেড়ে না গেলে ধৃতরাষ্ট্র কি আর সুযোগ পেত রাজমুকুট মাথায় দেবার। শুরু থেকেই ফিকশনের জন্ম হয়ে গেল যেদিন মাদ্রী কুরুবংশের কূলবধূ হয়ে হস্তিনাপুরে এল।

উপন্যাসের পাতায় পাতায় যেন উন্মোচিত হয়েছে মহাভারতের শ্লোকের ভারে হারিয়ে যাওয়া মাদ্রীর আঁতের কথা। বিবাহপরবর্তী জীবন থেকেই শুরু হয়ে গেছে তার এক অদৃশ্য লড়াই নিজের ভাগ্যের সাথে। সে জানত কুন্তী তাকে বিষ নজরেই দেখবে, তা মহাকবি যতই বলে বেড়াক না কেন কুন্তী তার বোনের মত; সপত্নীগত ঈর্ষা কোনদিনই সম্পর্কটিকে জুড়তে দেয় নি। এই উপলব্ধির পর সে খানিকটা বাধ্য হয়েই নিজে থেকে কুন্তীর প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর তারপরেই সে আবিষ্কার করল তার জীবনের সবথেকে চূড়ান্ত সত্য –স্বামী পাণ্ডু শারীরিকভাবে অক্ষম। যে সুখের নীড় বাঁধবার স্বপ্ন সে দেখেছিল, দাম্পত্যের শুরুতেই তা উবে গেল কর্পূরের মতো। ভীষ্মের পক্ষে পাণ্ডুর অক্ষমতা জানবার কথা

না থাকলেও মাদ্রীর নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে ভীষ্মকেই দায়ী মনে হল। ভীষ্ম জেনে বুঝেই তার জীবনটা নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলল। ঘরের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নই ভাবিয়েছে উপন্যাসের মাদ্রীকে। এখানেই ঘটে যায় পুরাণের নবীকরণ। ব্যপ্ত নীল চরাচরের দিকে তাকিয়ে মন প্রশস্ত করে এরপরেও তাই সে অনুভব করেছে স্বামী হিসেবে পাণ্ডু উদার, বন্ধুপরায়ণ। নশ্বর দেহটা অক্ষম বলেই মনের জানালাকে পাণ্ডু উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বাইরের খোলা বাতাস সেখানে নিত্য খেলা করতো বলেই ধীরে ধীরে পাণ্ডুকে ভালবেসে ফেলেছিল মাদ্রী। ভেবেও নিয়েছিল সারাজীবন চুমু খেয়েই কাটিয়ে দেবে, শারীরিক লিপ্সার আগ্রাসী খিদেকে নিষ্কাম ভালোবাসার উদার জগতে মুক্তি দিতে পা বাড়িয়েছিল দীপক চন্দ্রের মাদ্রী।

অন্যদিকে কুন্তীর ছিল আলাদা এক ছক, যার জন্যে পাণ্ডুই ছিল তার একমাত্র হাতিয়ার। এই চরিত্রটিও লেখকের নতুন আবিষ্কার। নিজের শরীরের জাগতিক বাসনাকে মিটিয়ে নিতে কুন্তী যেমন কখনো দ্বিধায় ভোগে নি, তেমনি রাজমাতা হবার বাসনাকেও সে ছেড়ে দেয় নি। এটা ঠিক, ভাগ্য তার কোনোদিনই অনুকূলে ছিল না। ছোটবেলা থেকেই ভাঙতে ভাঙতে কুন্তী শেষে পুরো অন্য এক নারীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার মাথায় রাজমাতা হবার ইচ্ছাটা কে ঢোকাল? তিনি আর কেউ নন স্বয়ং ব্যাসদেব, যিনি কিনা ভাগ্যচর্চা করে এই ভাগ্যলিপি জানতে পেরেছেন। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, কুরুবংশে ভীষ্মের পরে কেউই বিশুদ্ধ কুরুরক্তের জাতক ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েরই ব্যাসের ঔরসে জন্ম। যেহেতু ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সিংহাসনের অধিকার নেই অন্ধত্বের জন্য, একমাত্র তার সন্তান জন্মালে সেই এই সাম্রাজ্যের রাজা হবে। এই ভয় ব্যাসদেবকে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে দিচ্ছিল না। অথচ সেও তো ব্যাসেরই ছেলে, তাহলে তার সন্তানই যদিবা রাজা হয়, সেখানে ব্যাসের ভয়টা কিসের? আসলে ধৃতরাষ্ট্রের বিয়েটা ভীষ্ম দিয়েছিল নিজেদের বংশের মর্যাদার সাথে পাল্লা দিয়ে। সেখানে ব্যাসের কূটনীতি চলেনি। তাই পাণ্ডুর বিয়েটা ব্যাসদেব দিল কুন্তীর মতো যাদবরক্তের সাথে ভীষ্ম যেটা কোনদিনই মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। এর পেছনের রাজনৈতিক কারণ হিসেবে লেখক তুলে ধরেছেন তামাম ভারত রাজ্যের চিত্র। সেই সময় হস্তিনাপুরনরেশের স্থান ছিল শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গদের মধ্যে অন্যতম। একমাত্র সমধিক শক্তিশালী মগধ রাজ্যের জরাসন্ধের সাথে তাদের বিরোধ নেই। কিন্তু যাদব বংশধারার সাথে মগধের খুব একটা সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। যাদবদের সাথে মগধের লড়াই চলছিল। ফলত বিয়েটা ছিল এক জটিল রাজনৈতিক পরিণয়। পাণ্ডুর জৈবিক শিথীলতার কারণে তো আর এতদিনের পরিকল্পনাটা ভেস্তে দেওয়া যেতে পারে না। সমাধান সূত্রে ব্যাসদেব যেটা করলেন, সেটা হল কুন্তীর বিবাহপূর্বের ভাগ্য বিড়ম্বনার সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি। অন্যদিকে কুন্তীর বুকেও ছিল জীবন যুদ্ধে যে কোন পথে জয়ী হয়ে মাথা উঁচু করে বিশেষ সম্মানে আসীন হবার উগ্র বাসনা। বেদব্যাসের এই অভিসন্ধি সেই বাসনাকে শুধু উস্কে দিয়েছিল মাত্র। বাকিটা কুন্তী নিজেই করেছে। নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নেড়ে গিয়েছে ব্যাসদেব। সেখানেই দেখি, পাণ্ডু অপারগ হওয়া সত্ত্বেও জ্যোতিষগণনায় কিনা জানা গেল যে তারও হবে সন্তান আর কুন্তী হবে সেই সন্তানের রাজমাতা। এইখানেই কুন্তীকে দেওয়া দুর্বাসার সেই আশীর্বাদ – চাইলেই দেবতাদের সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হতে পারা যাবে, তা হাতিয়ার হয়ে উঠল। পাণ্ডুকে নিজের দিকে টানবার জন্যে কুন্তীকে এই কথাও বলতে শোনা যায়,

> এ পরিবারে এতো নতুন কিছু নয়।... মনে রেখ, জীবনে জেতাটাই আসল কথা। জয়ের পরে কীভাবে জিতল সে কথা কেউ মনে রাখে না। যে জিতল যে জয়ী হলো তার কথাই মনে রাখে। লোকে তার জয়টাকেই দেখে।[11]

যে নারী দৃঢ়ভাবে এই কথাগুলো বলতে পেরেছে, সে যে কী প্রচণ্ড মানসিক জোরের অধিকারিনী সেটা আলাদা করে বলবার দরকার নেই। রাজপরিবারের সকলের সামনে থেকে, এমনকি নিজের স্বামীর সাথে রাতের শয্যা ভাগ করে নেবার পরেও দেবর বিদুরের সাথে তার অবৈধ যে সম্পর্ক গড়ে উঠল, তা কারোরই নজরে পড়ল না। বিদুরই একমাত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর থেকেও উপযুক্ত রাজা হতে পারতো, কিন্তু ব্যসের ঔরসে শূদ্রারমণীর গর্ভে জাত বলেই সে সবদিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন হবার পরেও বঞ্চিত হল। তাই কুন্তী ও বিদুর, দুজনেরই এক অভিপ্রায় - দীর্ঘ অপমানের বদলা হিসেবে কুরুবংশের তক্তপোশে নিজের অধিকার জমানো। মহাভারতের কাহিনীকে এভাবেই নতুন ভাবে দেখে ফেলেছিলেন দীপক চন্দ্র।

এখানে লেখক একটি বিশেষ ঘটনার নবনির্মাণ করেছেন যা রীতিমত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। দেখাটা এখানে মাদ্রীর নজরে। হস্তিনাপুরে আসবার পর থেকেই মাদ্রীর চোখের সামনে এই রাজপরিবারের অনেক রহস্যজট খুলে যাচ্ছিল। প্রত্যেকেটি চরিত্রের মুখ ও মুখোশ আলাদা করে দেখতে পারছিল সে। যে ভীষ্ম তাকে এখানে নিয়ে আসে রাজবধূ করে, আসলে সেটা যে তার ব্যক্তি রাজনীতির কতবড় রণকৌশল ছিল উপন্যাসের মাদ্রী তা অনুভব করতে সক্ষম হল। তারপরেও সে কোনভাবে মানিয়ে গুছিয়ে নিয়ে, ভঙ্গুর দাম্পত্যকে জোড়া লাগিয়ে সংসারটিকে ভালোবাসবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই কোথা থেকে একটা গেল গেল রব তাকে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিল। মহাভারতে দেখেছি, বিয়ের এক মাসের মধ্যেই পাণ্ডু তার দুই স্ত্রীকে রেখে একাই দিগ্বিজয়ে বেড়িয়ে পড়েছিল। এমন কি তাড়া রাজ্য বিস্তারের যে বিয়ের একমাসের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত। এ কি নিজের অক্ষমতা লুকিয়ে রেখে হাঁপিয়ে ওঠার যন্ত্রণা! দুই আনকোড়া স্ত্রীকে চরম তৃপ্তি দিতে না পারার বেদনা! বিষয়টিকে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এভাবে দেখেছেন –

> আসলে স্ত্রীদের কাছে আপন অক্ষমতা লুকিয়ে রাখার জন্য, অথবা ক্ষমতার ধ্বজাটুকু জিইয়ে রাখার জন্যই পাণ্ডুকে দিগ্বিজয়ে বেরতে হল - বিয়ের পর তিরিশ রাত্তিরের অক্ষম বিহার সেরেই - বিহৃত্য ত্রিদশা নিশাঃ।[12]

রাজ্যজয় শেষে বহুদিন পর ফিরে এসে পাণ্ডু অর্জিত সব ধনরাশি গুরুজনেদের উপহার দিল। এদিকে পাণ্ডুর অবর্তমানে ধৃতরাষ্ট্র যে রাজ্য সামালাচ্ছিল, পাণ্ডুর প্রত্যাবর্তনে তা ফিরিয়ে দিতে টালবাহানা শুরু হল। যে সিংহাসন বড় দাদার পাওয়ার কথা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় তা গেল চলে ছোট ভাইয়ের হাতে। তাই হাতে ফিরে পেয়ে আবার সবকিছু ছেড়ে দেওয়া ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অস্বস্তিকর এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে পাণ্ডু বনযাত্রার জন্যে মনস্থির করল। দীপক চন্দ্রের উপন্যাসের বয়ান, এর পেছনে কুন্তীর একটা বড় ভূমিকা ছিল; কেননা কুন্তীর অবস্থা তখন কুরু পরিবারে ছিল রবাহুতের মতো। দমবন্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তির সন্ধানে সেও এই রাজনৈতিক আবর্ত থেকে পালাতে চাইছিল। আবার এভাবেও ভাবা যায় হয়তো সে একটু দূরে অবস্থান করে মেপে নিতে চাইছিল রাজনৈতিক উষ্মা কতোটা মাত্রা ছাড়িয়েছে এবং এই চাপানউতোরের ফাঁকে মাঝে নিজের পায়ের নিচের জমিটাও শক্ত করে নিতে চাইল। উপন্যাসে দেখি রাজমাতা হবার স্বপ্নে বিভোর কুন্তী একদিন জানতে পারল গান্ধারী গর্ভবতী,

মুহূর্তে তার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। কিন্তু সেকথা সে প্রকাশ না করে পাণ্ডুকে অন্যভাবে উৎসাহিত করতে লাগল এই বলে যে বনে গেলে সেখানে অনেক সাধুরা আছেন, তারা পাণ্ডুর এই জৈবিক সমস্যার একটা সমাধান বার করবেনই। যোগবলে কত কি না সম্ভব। যাই হোক, ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার ফাঁদে পড়ে পাণ্ডু স্ত্রীদের নিয়ে প্রব্রজ্যা নিল। মহাভারতে এরকম কিছুই নেই, সেখানে পুরোটাই গল্পের মত। মহাভারতকার অন্তত এভাবেই দেখাতে চেয়েছেন, তিনি পাণ্ডুর ব্যক্তিগত সমস্যাটিকে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেন নি। যে মহাভারতে এত জটিল মনস্তত্ত্বের অবতারণা করা হল, সেখানে রাজ্যপাট সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এই প্রব্রজ্যা গ্রহণ এতটাই স্বাভাবিক – এই খটকাই লেগেছিল ঔপন্যাসিকের।

অন্যদিকে বনবাসে গিয়ে চিত্তশুদ্ধি বা দেহজবল বৃদ্ধির পরিকল্পনা মাদ্রীর কাছে ভালো লাগল না। প্রথমত স্বামীর রাজ্যজয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সে সংসারে মন দিতে চাইছিল। বনে গিয়ে থাকবার প্রসঙ্গে তার অবাক হবারই কথা। মাদ্রীর মনে একটা ভয় দানা বাঁধতে শুরু করে যে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন একটা দূরভিসন্ধি রয়েছে। মনের এই ভয় নেহাতই অমূলক নয়। ধীর, স্থির শান্ত স্বভাবের মেয়ে হলেও রাজ্য-রাজনীতির গভীর ষড়যন্ত্র বোঝবার মতো দূরদৃষ্টি মাদ্রীর ছিল, জৈবিক প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করবার উপায় না থাকলেও কিন্তু তার সাথে ঝুঝবার একটা পথ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে চলছিল। অপরদিকে, বিদুরের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়ে কুন্তীর জীবনও অন্য খাতে বইতে শুরু করে দিয়েছিল। মাদ্রীর সাথে এখানেই কুন্তীর চরিত্রগত পার্থক্য, মাদ্রীর ভয়টাও এখানেই ছিল। সে বুঝতে পেরে গিয়েছিল তাদের এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের পেছনে কুন্তী ও বিদুরের মিলিত কৌশল কাজ করছে। কিছুদিন আগেই রাতের অন্ধকারে বিদুরের বক্ষলগ্না হয়ে কুন্তীকে সমর্পিত হতে দেখেছে। এখানে লেখক উপন্যাসের মোড়কে পুরাণের অন্ধকারে চাপা পরা একটি ঘটনাকে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে মেলাতে সচেষ্ট হয়েছেন। এমনকি এই দৃশ্য দেখে মাদ্রীর মধ্যকার নিষিদ্ধ কামও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। আরও একটি বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা উপন্যাসে লেখক অন্যভাবে অথচ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ভঙ্গিতে করেছেন। মাদ্রী হঠাৎই একদিন কুন্তীর বনে পালিয়ে যাবার ব্যাখ্যা খুঁজে পায়। আরও একজন এভাবে অজ্ঞাতে আত্মগোপন করেছিল নিজের সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থে - শান্তনু পত্নী গঙ্গা। পর পর সাতটি সন্তান মারা যাবার পর সে পরিবারের চক্রান্ত বুঝতে পেরে ভীষ্মের সময়ে হস্তিনাপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সন্তানসম্ভবা হবার পরে এই আত্মগোপন গঙ্গার আবশ্যিক ছিল। কুন্তীর মধ্যেকার চাঞ্চল্য মাদ্রীর চোখ খুলে দিল এবং পুরো বিষয়টি তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। পাণ্ডুকে বহুভাবে সতর্ক করা ছাড়া তার আর কিছুই করবার ছিল না। কাল যেন নিজের নিয়মেই এগিয়ে চলছিল। পাণ্ডুর কাছে আক্ষেপে মাদ্রীকে একথাও বলতে শোনা যায়,

> আমার শত্রু তো আমার পাশেই ছায়ার মতো সবসময় ঘোরে। তার নিঃশ্বাস লাগে আমার গায়ে। আমি বেশ বুঝতে পারি, সে শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছে। দেখো, একদিন তার হাতেই মরণ হবে আমার।... তোমার হস্তিনাপুর ছেড়ে যাওয়া নিয়ে অলক্ষ্যে একটা বিরোধ বেধেছে। এরা সংখ্যায় এখন অনেক। এ পরিবারে বধূ হয়ে আসা থেকে তাদের সঙ্গে এই ছায়া যুদ্ধ সমানে চলেছে। হস্তিনাপুর ছেড়ে যেতে তাই আমার ভয় হয়। ... তুমি না বললেও জানি কুন্তীই তোমায় হস্তিনাপুর ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। কেন দিল তা জানার চেষ্টা করনি। এটাই তোমার দোষ।[13]

এরপর সে সরাসরি একটা প্রশ্ন করেছে, গান্ধারী মা হচ্ছে শুনে পাণ্ডুর মন খারাপ করবার কি আছে? এটা তো ভালো সংবাদ, যদি না এর পেছন নিজ স্বার্থে ঘা লাগার ভয় থাকে। আসলে কুন্তীর রাজমাতা হবার বাসনার তাহলে সলিল সমাধি ঘটবে - একথা মাদ্রী যথার্থই বুঝেছিল; কিন্তু পাণ্ডুকে সে বোঝাতে অক্ষম হল। ফলত, সপরিবারে পাণ্ডুর বনগমন। আশ্চর্যের বিষয় যে পরিবারের কেউ বাধা দিল না। বনে গিয়ে প্রথমে তারা নাগশত পর্বতে থাকতে শুরু করে অথচ সেখানে তাদের বিলাস ব্যসনের কোন ত্রুটি হয়না। বিদুরের সহায়তায় সবই আগে থেকে প্রস্তুত ছিল। মাদ্রীর মনের সন্দেহ আরও পোক্ত হয়। আসলে সমস্ত কিছুর দর্শক হিসেবেই মাদ্রীকে যেন আমরা মহাভারতে পাই। দীপক চন্দ্র তার ভেতরের নারীত্বকে জাগিয়ে তুলে পাঠকের সামনে পেশ করলেন; যে মাদ্রী প্রশ্ন করতে জানে, কথা বলতেও জানে। তাই বনবাসে এসে কুন্তীর শরীর খারাপের প্রসঙ্গে বলে উঠেছে- *'বাইরে ঠাণ্ডা খুব। এসময়ে ঠাণ্ডা লাগানো খারাপ'*। কেউ কারও কাছে মুখ না খুললেও সবই বোঝা হয়ে গেল। এরপর ঘটনা খুব জলদি এগিয়ে গেছে। কুন্তীও আর দেরি না করে পাণ্ডুর কাছ থেকে পরোক্ষে সন্তান জন্ম দেবার অনুমতি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। মাদ্রী সব বুঝেছে আর যন্ত্রণায় পুড়ে মরেছে। এ কোথায় আজ এল সে! পাণ্ডুকে মাদ্রী সত্যিই ভালোবেসেছিল, তাই স্বামীর বিশ্বাস ভাঙ্গার মতো কোন কাজই সে করেনি। দুর্বাসার বরের আড়ালে কুন্তীর ব্যভিচার মাদ্রীকে তার প্রতি বিরূপ করে দিয়েছিল। অন্যদিকে হস্তিনাপুর থেকে খবর পেল যে গান্ধারীর গর্ভপাত হয়েছে। একথাও কিনা বেদব্যাস জানতেন। তাহলে কুন্তীর এত দুশ্চিন্তার কি ছিল? অনিবার্যভাবে সেই তো হবে রাজমাতা। সব ঘটনাই কি অদ্ভুত ভাবে সাজানো! কিন্তু মাদ্রী এর পেছনে জঘন্য চক্রান্তকে টের পেল যাকে সাদা চোখে যায় না।

যুধিষ্ঠির জন্মানোর সাথে সাথে কুরু বংশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। কুন্তীর রাজমাতা হওয়া এবং যুধিষ্ঠিরের যুবরাজ হওয়াটা যে সহজ হবে না, সেটাও অনুমেয়। একে একে বাকি দুই সন্তান জন্মালো। সন্তান জন্মের কাহিনীকে লেখক এক নতুন দৃষ্টিকোণে বিচার করলেন যেখান থেকে পুরাণ হয়ে উঠল সত্যিই নবপুরাণ। মূল মহাভারতে রয়েছে, রেবতী ও অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের প্রসাদে মাদ্রী নকুল-সহদেবের জন্ম দেয়। এরপর এক পর্বত থেকে তারা অন্য পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বসন্তকালীন এক মনোরম দিনে রাজা পাণ্ডু যখন বনবিহার করছিলেন, মাদ্রীও তার সাথে সাথে ঘুরছিলেন অত্যন্ত রম্যবসনে। প্রকৃতির মনোময় শোভা ও মাদ্রীর শরীরি আকর্ষণে পাণ্ডু নিজের মৃত্যুশাপ ভুলে গিয়ে মাদ্রীকে বলপূর্বক আলিঙ্গন করে সহবাসে লিপ্ত হলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মাদ্রীর কান্না শুনে কুন্তী পুত্রদের নিয়ে সেখানে ছুটে আসে। মাদ্রী পুত্রদের সেখানে আনতে মানা করে। কুন্তীর ধিক্কার শুনে মাদ্রী জানায় শত চেষ্টা করেও রাজাকে আটকাতে পারেনি সে। এরপর পাঠককে হতবাক করে সে বলে, তার কামনা চরিতার্থ হয়নি, তাই স্বর্গে গিয়ে তৃপ্ত হতে চায়। তাছাড়াও পাণ্ডুর অতৃপ্ত কামনা জর্জরিত আত্মার শান্তির জন্য তারই সহমৃতা হওয়া উচিত। এরপরে সবথেকে নিদারুণ শব্দ গুলো উচ্চারণ করে বলে কুন্তী যেন নিজ পুত্রদের সাথে তার দুটি সন্তানকেও রক্ষা করে, কেননা কুন্তী সহমৃতা হলে মাদ্রী হয়তো কুন্তীর মতো করে স্বপত্নী সন্তানদের প্রতি উদার হতে পারবে না। এইবলে সে স্বামীকে আলিঙ্গন করে দেহত্যাগ করে। মহাভারতের এই মাদ্রীকে আজকে যদি অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করা যায় তাহলে কী এর ভেতরে পক্ষপাতিত্ব চোখে পড়ে না? প্রথমত, যে মাদ্রী রাজা পাণ্ডুর জন্যে শারীরিক বাসনাকে অস্বীকার করে দিনাতিপাত করছিল, সেই মাদ্রী

হঠাৎ করেই পাণ্ডুর মৃত্যুর কারণ কেন হতে গেল? দ্বিতীয়ত, পাণ্ডুই বা কেন এতদিনে জেনে বুঝে কামনাজর্জর হল যে নিজ মৃত্যুকে পর্যন্ত অবহেলা করল? তৃতীয়ত, মহাভারতের সময়ে তো সহমরণ প্রথা এতটাও প্রচলিত ছিল না। মাদ্রীর পূর্বের কুরুবধূ সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকারা বৈধব্য দশাই তো কাটাচ্ছিলেন, তারা তো সহমৃতা হন নি। তাহলে মাদ্রী কেন হল? চতুর্থত, নিজ সন্তানদের দিকে একবারও সে ঘুরে তাকাল না, কামনা পূরণের নিমিত্তে মৃত্যুবরণ তার কাছে বড় মনে হল! বিশ্লেষণ করতে বসলে মনে হয়, এতো কিসের তাড়াহুড়ো ছিল। দীপক চন্দ্র যেন সেই ফাঁক গুলোকেই জোড়া লাগানোর প্রয়াস করছিলেন।

‘মাদ্রীর কণ্ঠস্বর’ উপন্যাসে মহাভারতের এই অংশটিকে পুরো আলাদা দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নকুল সহদেবের মা হিসেবে কুন্তীকেই দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ সকলেই বিদুরের সন্তান। সেই সময় এক নারী তিন পুরুষের বেশি নিয়োগ প্রথায় সন্তান ধারণ করতে পারত না, যতই তা দেবতার নামে প্রচারিত হোক না কেন। কুন্তী নিজের শেষ দুই সন্তানের মাতৃত্ব মাদ্রীর ওপর জোর করে আরোপ করতে চেয়েছে সমাজের কাছে মন্ত্রের গোপন ধাপ্পা টিকিয়ে রাখতে। অথচ মাদ্রী তা অস্বীকার করে। কিন্তু কুন্তী পাত্তা দেয় নি। অবাক করে যে কুন্তীর মনে এতটুকু ভয় ছিল না। কূটরাজনীতির যে প্যাঁচে কুন্তী পাণ্ডু ও মাদ্রীকে ফেলে দিয়েছিল, সম্ভবত মৃত্যু ব্যতীত সেখান থেকে বেরনোর আর কোন পথ ছিল না। হয়তো কুন্তীর মনে মাদ্রীর নামে আরও সন্তান জন্ম দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও থাকতে পারতো। কিন্তু পাণ্ডুর মৃত্যু সেই রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে অন্য রাস্তা খুলে দিল। এই পথের শেষেই কুন্তীর গন্তব্য। অথবা এভাবেও ভাবা যায়, পাণ্ডু বুঝে গিয়েছিল কুন্তীর এই চক্রবুহ্য থেকে বেরনোর পথবন্ধ। যদি বাঁচতে হয়, তবে কুন্তীর দেখানো পথেই বাঁচতে হবে। তাই যেন সে নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই গ্রহণ করল। যে পাণ্ডু এতদিন সযত্নে সম্ভোগলিপ্সা এড়িয়ে গেল, সেই কিনা এক দুপুরে চিরচেনা মাদ্রীকে দেখে আত্মহারা হয়ে আত্মত্যাগ করতে চলে গেল। অন্যদিকে, পাণ্ডুর এই মৃত্যু দেখে কুন্তী অতিনাটকীয় ভাবে মাদ্রীকে শুনিয়ে বলতে লাগল যে কুরু পরিবারে কি করে মুখ দেখাবে, এর থেকে তার মরণ হল না কেন। কুন্তীর শেষটুকু চিনতে আর বাকি থাকে না মাদ্রীর। সে বুঝে যায়, পাণ্ডু চলে গেছে, এবার পথের কাঁটা মাদ্রীকেও সরে যেতে হবে, নইলে সরিয়ে ফেলা হবে হয়তো অন্য উপায়ে। সে সম্মোহিতের মতো তাই উচ্চারণ করে –

> আমার সাধ্য ছিল না তাকে বাধা দেবার। এটাই ছিল ওর নিয়তি। আমি নিমিত্ত দিদি। আমার মরণটা তোমার হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তনের পথটাকে অনেক সহজ করে দেবে। বেঁচে মরে থাকার চেয়ে, মরে বেঁচে থাকা ভালো।[১৪]

মাদ্রীর এই মরণ ঝাঁপ কুন্তীর জয়ের রাস্তা খুলে দিল। সে তাদের শব বহন করে হস্তিনাপুরে ফিরে গিয়ে নিজের আসন পাকা করে নিল। এবার শুরু হল বৃহত্তর স্বার্থের লড়াই। অন্যদিকে শ্রান্ত মাদ্রী স্বস্তির নিদ্রায় ডুব দিল। সে জীবনের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে পাণ্ডুর মতোই মৃত্যুকে বেছে নিয়ে রাজনীতি ও অপমানের জীবন থেকে নিজের আত্মাকে মুক্তি দিল।

কিন্তু মাদ্রীর বলে যাওয়া শেষ কথা গুলো কুন্তীকে কোনদিনই শান্তি দেয় নি। সে হতে চেয়েছিল রাজমাতা, হয়েওছিল। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে লড়াই করেই যেতে হয়েছিল। সুখ তার ভাগ্যে

থাকলেও জীবনে সে স্বস্তি পায় নি একদিনের জন্যেও। মৃত্যুটাও তার হয়েছিল বাণপ্রস্থের বনবাসে দাবানলের আগুনে পুড়ে। বড়ই অদ্ভুত। সারা জীবনটা ঘরে-বাইরে জ্বলে খাক হওয়ার পরে মৃত্যুটাও হয়েছিল কুন্তীর আগুনে। মাদ্রীর অন্তরাত্মা যে চাপা শোকে আত্মাহুতি দিয়েছিল, তা কুন্তীকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। দীপক চন্দ্রের দরদী কলমে মাদ্রীর রুদ্ধ হয়ে থাকা আর্তনাদ এভাবে ভাষা পেল। হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে অন্তর বিদীর্ণ করা হাহাকারে মাদ্রী তার কথা শোনাল, মাদ্রীকে নিয়ে অনন্য চিন্তাভাবনার দরজা গেল খুলে।

আলোচনার সমাপ্তিতে এসে বলা যেতে পারে, উপন্যাসের আঙ্গিকে বিচিত্র বয়ানে মহাভারতের এই নারীটিকে যেভাবে পুনর্নির্মিত হতে দেখি সেখানে আধুনিক জীবনধর্ম ও দর্শনই বড় হয়ে উঠেছে। বাস্তবিকই যেন মাদ্রী সেদিন রাজনীতির শিকার হয়েছিল, রাজনীতির গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু একজন মহিলা যে এই সমস্ত অপমান চুপচাপ সহ্য করে নেবে, এটা দীপক চন্দ্র মানতে নারাজ ছিলেন বলেই মাদ্রীকে নিয়ে এই অনন্য পরিকল্পনা। এরই জন্য দীপক চন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন, মাদ্রীরও একটা নিজস্ব বক্তব্য ছিল। বিরাট মহাভারতের রাজনীতির গুটি হয়েও, তার শিকার হয়েও সে নিজের বিশ্বাসে অটল থেকেছে। আত্মসমর্পণ করেনি। আর এটাই যেন আমাদের কাছে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে আদি মহাভারতের মাদ্রী চরিত্রটি থেকে। মাদ্রী তো কোন সাধারণ মহিলা চরিত্র নয়, সে মহাভারতের মত মহাকাব্যের একটি প্রধান নারীচরিত্র। এর জন্য তার চরিত্রটা অনেক বেশি জোরালো হবে, এটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। দীপক চন্দ্র যেভাবে মাদ্রীকে দাঁড় করালেন, তার মধ্য দিয়ে আমরা পেলাম যে, ওই সময়ের একটি মেয়ে যে পৌরাণিক যুগের হয়েও আধুনিক। সেযুগে মেয়েরা বিবাহের নামে এভাবেই তো রাজনীতির শিকার হত। তাদের জন্মপরিচয়েই তারা রাজনৈতিক লক্ষ। সেটা আমাদের সামনে ফুটে উঠল আরো একবার। কিন্তু সেখানে মেয়েরা যে তার প্রতিরোধ করে উঠতে, এটাই দেখা গেল দীপক চন্দ্রের উপন্যাসে। বড়মাপের সাহিত্যের এটাই বিরাট গুণ - যা পৌরাণিক যুগেও প্রাসঙ্গিক ছিল, সেটা আজকের যুগেও প্রসঙ্গোচিত। দীপক চন্দ্রের অনবদ্য বর্ণনকৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি নতুন করে পাঠকদের ভাবতে বাধ্য করেছে মহাকাব্যটিকে। এইজন্য মাদ্রী চরিত্রটি খুবই আনুষঙ্গিক যে মহাকাব্যেকে সে আধুনিক করে তুলেছে। তাই আজকের যুগে মাদ্রী চরিত্রটি মহাভারতের মতই প্রাসঙ্গিক।.

সূত্র-নির্দেশ :

[১] N N Ghosh, *Early History of India*, The Indian Press Ltd. , Allahabad, First Ed 1939, Thired Ed 1951, p. 37

[২] R C Majumdar, ‘Ideas of History in Sanskrit Literare,’ in C H Philips (ed), *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, OUP, London, 1961, Pp. 13-26

[৩] দীপক চন্দ্র শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা বিশ্বে একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীটির বিচিত্র এবং আকর্ষণীয় উপাখ্যানগুলির উপর ভিত্তি করে তাঁর সৃজনশীল কল্পিত উপন্যাসগুলি এখনও অবধি) ৮৫) রচিত হয়েছে। পুরাণ বিষয়ে একাধিক গল্পগ্রন্থও রচনা করেছেন তিনি। ভগিনী নিবেদিতাশ্রীচৈতন্যদেবের ওপরেও ,

তাঁর চিন্তনশীল উপন্যাস রয়েছে।এ বাদেও তিনি বেশ কিছু সামাজিক উপন্যাস ও ছোটগল্প সমগ্র রচনা করেছেন। দীপক চন্দ্রের কথাসাহিত্য পাঠক শ্রেণীর মধ্যে সুপাঠ্য ও জনপ্রিয় এবং তাঁর পৌরাণিক রচনাধারা বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ ঘরানা তৈরি করেছে।

[৪] সাহিত্যিক দীপক চন্দ্র তাঁর মহাকাব্য নির্ভর লেখাগুলোতে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারা প্রয়োগ করেছেন। রামায়ণ-মহাভারত উভয় কাব্যের মধ্যে যে বিষয়গুলোতে অতিনাটকীয়তা ও দৈব প্রভাব আছে, সেখানেই তিনি তাঁর উপযুক্ত কারণ অনুসন্ধান করেছেন। বিশেষ করে, মহাভারত নিয়ে তাঁর লেখা কথাসাহিত্যে যুক্তি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন মহাকবি ব্যাসদেব সকলের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করেন নি। পাণ্ডবদের এভাবে জিতিয়ে দেবার পেছনের রহস্য দীপক চন্দ্রকে আকর্ষণ করেছে। সেখানে কৃষ্ণ থেকে শুরু করে ভীষ্ম, দ্বৈপায়নসত্যবতী ,কুন্তী , প্রায় প্রতিটি চরিত্রকে মহাকাব্যিক পরিমণ্ডল থেকে বের করে তাদের স্বার্থ খুঁজেছেন। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম', 'মহাভারতের পাশা', 'মহাভারতের পঞ্চমাতৃকা' ইত্যাদি ও আরও অন্যান্য বইগুলোতে মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল, লেখকের দৃষ্টিতে তা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনই মহাভারতের জোড়াতালি দেওয়া ঘটনাগুলোর কার্যকারণ খুঁজে দেখা হয়েছে।

[৫] দীপক চন্দ্রের পূর্বে পৌরাণিক উপন্যাস ধারা বলে পৃথক কোনও ধারা সাহিত্যজগতে ছিল না। মহাকাব্য থেকে উপাদান নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য ধারায় লেখালেখি হলেও উপন্যাস ধারায় এর প্রচলন খুবই কম ছিল। প্রমথনাথ বিশী, সমরেশ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিমল কর, হর্ষ দত্ত প্রমুখের মতো সাহিত্যিকেরা এক দুটির বেশি উপন্যাস এই ধারায় লেখেন নি। একমাত্র দীপক চন্দ্র একাধিক গল্পউপন্যাস নির্মাণ করে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক উপন্যাস নামে একটি ধারা- বলবৎ করতে সক্ষম হলেন। দীপক চন্দ্র ব্যতীতউক্ত বিষয়ে একটানা সুগভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায় নি। তবে বর্তমানে পুরাণের নানা কাহিনীকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার প্রবণতা বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে। এক্ষেত্রে মিহির সেনগুপ্ত, তিলোত্তমা মজুমদারবাণী বসু প্রমুখ , সাহিত্যিকদের নাম নেওয়া যায়।

[৬] দীপক চন্দ্রের রচিত মহাকাব্যকেন্দ্রিক বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল- শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম (অখণ্ড সংস্করণ), রামের অজ্ঞাতবাস, তোমারই নাম কর্ণ, পিতামহ ভীষ্ম, দশানন রাবণ, এবং অশ্বত্থামা, দ্বৈপায়নে দুর্যোধন, কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন, সম্রাজ্ঞী কুন্তী, গান্ধারী-কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী, দ্রৌপদী চিরন্তনী, সুভদ্রা অনন্যা, আশ্রমকন্যা শকুন্তলা, উর্বশী জননী ইত্যাদি একাধিক উপন্যাস ও বহু ছোটগল্প তিনি রচনা করেছেন।

[৭] দীপকচন্দ্র,'প্রসঙ্গ: পৌরাণিক উপন্যাস ও তার মূল্যায়ন', ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, দীপকচন্দ্র, *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম,* প্রথম অখণ্ড সংস্করণ ১৯৮৬, দে'জ সংস্করণ ১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩

[৮] দীপক চন্দ্র, 'দৃষ্টিকোণ', *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম,* প্রথম অখণ্ড সংস্করণ ১৯৮৬, দে'জ সংস্করণ ১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ১০

[৯] সুবোধঘোষ, 'বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকাল রস –ভূমিকা', প্রমথনাথ বিশী, সুবোধঘোষ, *ভারত প্রেমকথা,* আনন্দপাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১৩৬২, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১৭, কলকাতা, পৃ. ৯

[১০] দীপকচন্দ্র, 'দৃষ্টিকোণ',*মাদ্রীর কণ্ঠস্বর,* দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ৫

[১১] দীপকচন্দ্র,*মাদ্রীর কণ্ঠস্বর,*দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, কলকাতা,পৃ. ৪৫

[১২] নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, 'কুন্তী', *মহাভারতের অষ্টাদশী,* আনন্দপাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ২০১৩, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ২৮০

[১৩] দীপকচন্দ্র,*মাদ্রীর কণ্ঠস্বর,* দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ৫৯.

[১৪] দীপকচন্দ্র,*মাদ্রীর কণ্ঠস্বর,* দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ১০৬